International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-VI, May 2016, Page No. 7-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

মোঃ নাছির উদ্দিন

পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

শাহ্ শ্যামুয়েল কায়জার

সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এণ্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস), ঢাকা, বাংলাদেশ

ড. কুদরাত-ই-খুদা (বাবু)

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, কক্সবাজার, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালের আন্তর্জাতিক সদস্য

Abstract

This article focuses on the the process of born of Bangladesh. Basically the Language Movement of 1952 was the first step of independence of Bangladesh. Political and economic deprivation of the Bengalees prompted Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, to put forward in 1966 his historic six points, which in effect structured the foundation for East Pakistan's future independence. In the 1970 elections, even though the Awami League emerged as the largest party in Pakistan Parliament, it was not allowed to form the Govt. by the ruling military junta. Bangabandhu declared at a historic public meeting at Ramna Race Course on 7th March 1971, attended by around 2 million people for independence. It was a defacto declaration of independence.Thus in a preplanned manner on 25th March 1971. The Pakistan army embarked on what may be termed as history's worst genocide. A military crackdown was ordered, and Bangabandhu was arrested. But just before he was arrested he sent out a call for the liberation war to begin. After nine months of war, the Pakistani occupation forces surrendered in Dhaka on 16th December 1971 after killing an estimated three million people. Due to the heroic resistance and supreme sacrifices of the valiant freedom fighters Bangladesh finally became an independent sovereign state.

ভূমিকা: বাঙালি অধ্যুষিত ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন একটি ঐতিহাসিক বিষয়। বাঙালিরা তাদের সুচিন্তিত ও জাতিসত্তাগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের অনেক আগে থেকেই ভোগ করে এসেছে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন। ব্রিটিশরা তাদের শাসনকালের শেষদিকে প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সুবিধা সামনে রেখে ভারতকে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেললেও বাংলা অঞ্চল সবসময়ই রাজনৈতিকভাবে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।[১] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময়ে আসামের একাংশসহ পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি অর্জন করে এবং পশ্চিম বাংলা একটি রাজ্য হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে

[১] ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলা ছিলো দু'ভাগে বিভক্ত। আসাম ছিলো পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের একটি অংশ।

বাঙালিরা ধর্মের ভিত্তিতে পুনরায় জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। ফলে একই ভাষা ও জাতিসত্তার অধিকারী হলেও বাংলা অঞ্চলের সার্বভৌমগত বিভক্তির কারণে দু'অঞ্চলের বাঙালিরা পৃথক ধরনের সামাজিক আচরণ অবলম্বন করে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দুটি পৃথক ধরনের সাংস্কৃতিক কাঠামোর গোড়াপত্তন ঘটায়। অবশ্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের স্পৃহা লুপ্ত হয়ে যায়নি।[২] এর আগে বাঙালিরা যেখানে বৃটিশ ভারতের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেছে, সেখানে পাকিস্তান আমলে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেছে পাকিস্তানের একটি পৃথক ও পরিপূর্ণ প্রাদেশিক কাঠামোর অধীনে। যা বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরো যৌক্তিক ও জোরদার করে তুলেছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য: 'বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যেসকল তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলতঃ দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত-যা দেশে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার দলিল, প্রামাণ্য বস্তুসামগ্রী, প্রাসঙ্গিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা এবং প্রাসঙ্গিক অডিও-ভিডিও প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ বা সেকেন্ডারি ডাটা। প্রবন্ধটিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বইপত্র, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত বাংলাদেশের ইতিহাস, জন্মকথা সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, সাময়িকী, সুভেনিয়্যর, পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সেই দেশের নাগরিকদের অবশ্যই সেই দেশের জন্ম কথা তথা ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা, সেই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। 'বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধটির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্মলগ্নের মূল প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে পরবর্তীতে যে ধরনের ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে তথা বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও শোষণ-বঞ্চনার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক দেশটি স্বাধীনতা লাভ করেছে তার স্বরূপ জানা ও জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক ইতিহাস: ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত দেড়শ বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করে। ১৫৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে। মীরকাশিম শেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার মসনদের মালিকানা ও ক্ষমতা এদেশীয় রাজপুরুষদের হাতে রাখার সংগ্রামের অবসান ঘটে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ ফকির ও সন্যাস বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল চল্লিশ বছর ধরে চলেছিলো। ১৭৬৩ সালে একদল ফকির ঢাকার কোম্পানি কুঠি আক্রমণ এবং তা দখল করে নিয়েছিলো। ১৭৬৯ সালে সন্ন্যাসীরা রংপুর আক্রমণ করে এবং লেফটেন্যন্ট কীনের নেতৃত্বে পরিচালিত একদল ইংরেজ সেনাকে পরাস্ত করে, কীন নিহত হন। ১৭৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রংপুর শহরের কাছে শ্যামগঞ্জে ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাথে সন্ন্যাসীদের সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হয়। এভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ফকির ও সন্ন্যাসীরা কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও অবাধ লুণ্ঠনে বাধা প্রধান করেছে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশীয় জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করে। তারপর থেকে ইংরেজ সাহায্যপুষ্ট এই জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর পরগণায় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে ১৮৩৩ সালে শেরপুরের পার্বত্য জাতি গাড়ো এবং হাজংরা করমশাহ নামক জনৈক দরবেশের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর হাজং অঞ্চলে পুনরায় বিদ্রোহ হয়েছিল মনি সং-এর নেতৃত্বে।

১৮৩১ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবীদের বিদ্রোহ শুরু হয়। সৈয়দ আহমদের শিষ্য তিতুমীর বা নিসার আলি কোম্পানীরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিতুমীরের মৃত্যুতে ওয়াহাবী আন্দোলন থেমে থাকেনি। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলেছিলো। ফরিদপুরের সংগ্রামীরা 'ফরাজী' নামে পরিচিত ছিলো আর এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পরে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই

২। বাংলার মুসলমানরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পুত্র দুদু মিঞা। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার ফরাজীরা জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের একশো বছর পরে ১৮৫৭ সালে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতীয় ঐতিহাসিকরা যে বিদ্রোহকে 'প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানের' মর্যাদা দান করেছেন। সিপাদী বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর প্রভাবে বাংলার প্রজাবিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো। ১৮৫৯-৬০ সালে নীল চাষীদের প্রতিরোধ চরম আকার ধারণ করে। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনা, বগুড়া ও অন্যান্য জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৬৮-৬৯ সালে উত্তরবঙ্গে আবার ওয়াহাবী বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। এই সময়ে বহু ওয়াহাবী নেতাকে বন্দী ও বিচার করা হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও তার স্বরূপ: ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে বিকেন্দ্রীকরণের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তারই ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের ধারণা চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়া হয়। এই আইনের ৫নং অনুচ্ছেদে ভারতকে রাজ্য ও প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেশন হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা বিধিবদ্ধভাবে বন্টন করে দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এক ফেডারেল ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিলো। ফেডারেল তালিকায় আইটেম ছিলো ৫৯। অন্যদিকে প্রাদেশিক তালিকা ও উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তালিকায় এই আইটেমের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৫৪ এবং ২৫। যদিও ফেডারেল তালিকায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সবগুলো প্রধান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো, তবুও কতিপয় বিষয়ে প্রদেশগুলোর হাতেও ন্যস্ত করা হয়েছিলো চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। এভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বশাসন প্রক্রিয়া মেনে নেওয়া হয়েছিলো।

এ কে ফজলুল হক ও লাহোর প্রস্তাব: ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ গতিবেগ অর্জন করতে থাকলে বাংলার মুসলমানেরা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পাকিস্তান আন্দোলনকে তারা সমর্থন দিয়েছিলো এ কারণে যে 'লাহোর প্রস্তাবে' শুধু মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য থেকে অভ্যাহতিই নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতারও আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো। বাঙালি নেতা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি করে বলা হয়েছিলো, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনের মতামত হলো এই যে, নিম্নরূপ মৌলিক নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত না হলে কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা এখানে কার্যকর করা যাবে না এবং এদেশের মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সেগুলো হলো: ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে এমন কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়, যেখানে প্রত্যেকটি ইউনিট হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত। প্রত্যেকটি ইউনিটের সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর এবং অবশ্য পালনীয় রক্ষাকবচ বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ অন্যান্য অধিকার আদায় করতে হবে। এই অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটিকে উপর্যুক্ত নীতিমালার অনুসরণে এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের অনুমোদন প্রদান করেছে যা চূড়ান্তভাবে অঞ্চলসমূহকে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ, শুল্ক এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ প্রয়োগের ক্ষমতা দেবে।

ভারতের সবকটি প্রদেশের মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলীম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে শুধু স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের কথাই বলা হয় নি। বরং ভবিষ্যৎ সংবিধানে কিভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছিলো। সাথে সাথে ওয়ার্কিং কমিটির হাতে দেয়া হয়েছিলো উপর্যুক্ত নীতিমালার অনুসরণে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

১৯৪৬ সালের ১৮ জুলাই ভারতে দুটি পৃথক রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিধান সৃষ্টি করে বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন। হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাঞ্জাব ও বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আইনের ৩(১) অনুচ্ছেদ বলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনস্থ বাংলা প্রদেশের অস্তিত্ব বিলোপ করা হয় এবং পরবর্তীতে সৃষ্টি করা হয় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে পৃথক দুটি প্রদেশ। অনুরূপভাবে ৪(১) অনুচ্ছেদ বলে পাঞ্জাবের অস্তিত্ব বিলোপ করে গঠন করা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশ। পূর্ব বাংলা ও পাঞ্জাব পশ্চিম পাকিস্তানের দুটি পরিপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আসামের সিলেট জেলা পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আইনের ৩(৩)নং অনুচ্ছেদ বলে পূর্ব বাংলা প্রদেশের একটি অংশ পরিগণিত হয়।

পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের জনগণের আকাঙ্খা ছিলো পাকিস্তান কাঠামোর অধীনে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এসময়ে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ খারাপ হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল বিশেষের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নগুলো প্রাদেশিক নেতৃবর্গের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকার সচেতন জনগণ অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানই প্রথমবারের মতো তাদের অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন এলিটবর্গের মুখোমুখি হয়। পাকিস্তানের নেতৃবর্গ লাহোর প্রস্তাব অনুসারে "স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম" রাষ্ট্রসমূহ গঠনের উৎসাহ না দেখানোর ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকেই আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন আদায়ের আন্দোলন শুরু করার উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ছিলো একটি বৃটিশ উপনিবেশের কাঠামো অনুসারে প্রণীত এবং আইনের সপ্তম তফসীলে উল্লেখিত প্রাদেশিক আইনসভার তালিকানুসারে পাকিস্তানে স্বাধীকারভিত্তিক কোনো প্রদেশ গঠনের মতো পর্যাপ্ত বিধান রাখা হয়নি। প্রথমবারের মতো বড় ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষাগত প্রশ্নে।

প্রথম গণপরিষদ: ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন (অনুচ্ছেদ ৮) পাকিস্তানের প্রথম কার্যকর সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বলে ভারতীয় আইনসভার অধীনস্ত যেসব অঞ্চল পাকিস্তানে যোগ দেয়, সেসব অঞ্চলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয় একটি গণপরিষদ। এদের সংখ্যা ছিলো ৬৯। পরবর্তীকালে তা ৭৪ জনে বাড়ানো হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়ণে প্রথম মূখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গণপরিষদের প্রায় ঊনিশ মাস সময় লেগেছিলো। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় পরবর্তীকালে যা বিষয়গত প্রস্তাব বা অবজেকটিভ রেজুলিউশন নামে পরিচিত অর্জন করে। বিষয়গত প্রস্তাবের মৌলিক নীতিমালা ছিলো এই যে, রাষ্ট্র তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সুবিচারসহ ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে; সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্মপ্রচার ও পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং নিজ নিজ সংস্কৃতি পালন করতে পারবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে নির্দেশিত সীমাবদ্ধতাসহ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ইউনিট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে ফেডারেল কাঠামোর অধীনে অবস্থান করবে। গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত প্রধান কমিটির নাম ছিলো মূলনীতি কমিটি। এর দায়িত্ব ছিলো বিষয়গত প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই কমিটি তার সুপারিশ প্রণয়ন করতে গিয়ে আঠার মাস সময় নেয় এবং প্রতিবেদন পেশ করার পর দেখা যায় তা ছিলো কার্যকর করার অনুপযোগী। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। প্রথমবারের মতো বাঙালিরা কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে সংগঠিত হয় এবং মূলনীতি কমিটির সুপারিশমালা সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিবেদনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয় সেটি হলো এই যে সুপারিশকৃত পদ্ধতির একটি সংমিশ্রণ যাতে রাষ্ট্রপতির হাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছিলো।

নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের ও তাদের ভূমিকা: পূর্ব বাংলায় মূলনীতি কমিটি বিরোধী আন্দোলন জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যের সূচনা ঘটায় এবং রাজনৈতিক সংজ্ঞায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন একটি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইতিমধ্যে কতিপয় শক্তিশালী সংগঠন পরিপূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলো। পরিবর্তীকালে ছাত্রলীগ নামে পরিচিতি অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করেছিলো। যে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন এই সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক। এই সংগঠনের অধিকাংশ ছাত্রসদস্য পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিমাতৃসুলভ আচরণে এরা ছিলেন হতাশাগ্রস্ত। পূর্ব বাংলা মুসলিম আওয়ামী লীগ নামে এই রাজনৈতিক দলটি পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৪৯ সালের ২৩জুন আত্মপ্রকাশ করে।[৩] এর সভাপতি নিযুক্ত হন মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতম (অপর একজন যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ)। এই নবগঠিত রাজনৈতিক দলের ৪২ দফা বিশিষ্ট ইশতেহারের প্রথম দুটি দাবি ছিলো: (১) লাহোর প্রস্তাব অনুসারে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে বাংলার জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন ও (২) বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের

৩। পরবর্তীতে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করে এটি আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত হয়।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদাদানের দাবীটি ছিলো অবশ্যই বৈধ। দাবিগুলো খুব দ্রুত দেশের মধ্যবিত্ত জনগণের সমর্থন অর্জন করে এবং এভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আওয়ামী লীগের প্রতি গণসমর্থন ভিত্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

জাতীয় মহাসম্মেলন (১৯৫০): ১৯৫০ সালের অক্টোবরে প্রথম সপ্তাহে বিরোধী দল গোষ্ঠীসমূহের কতিপয় রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও আইনজীবী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি "গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সংগ্রাম কমিটি" (কমিটি অব এ্যাকশন ফর ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন) গঠন করেন। পরবর্তীতে এই কমিটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশন নামে পরিচিতি অর্জন করে। এই সংগঠন মত প্রকাশ করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার প্রক্রিয়া প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পাকিস্তান ফেডারেশনকে অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পরবর্তীতে বামপন্থী ও প্রগতিশীল যুব সম্প্রদায় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আদায়ে নেতৃত্ব দিতে থাকে- যে দুটির মধ্যে প্রোথিত ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ।

যুবলীগের আত্মপ্রকাশ: পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন এবং ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত মুহূর্তে উপনীত হবার প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ এবং তার ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ছাড়া আর একটি নতুন ও শক্তিশালী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে যুবলীগ একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের নীতিমালার একটি অংশ হিসেবে যুব লীগের কোনো কোনো কর্মী আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের মধ্যে অবস্থান করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। যুবলীগের অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গণ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে এবং এবার তাতে কিছুটা আদর্শবাদের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ এদের অধিকাংশ নেতা জেলখানায় অন্তরীণ হয়ে যান। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিমূলক দিকগুলোর উপর আরোপ করে যুবলীগের সদস্যরা অচিরেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবিভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলকে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভাষা ও ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ করাচীতে গণপরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করে যে 'পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিধায় উর্দু হবে এখানকার রাষ্ট্রভাষা।' বাঙালিরা তাৎক্ষণিকভাবে এর বিরোধীতা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের শ্লোগান তোলেন এবং ১১ মার্চ হরতাল পালন করা হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে একের পর এক বিক্ষোভ মিছিল, জনসভা ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। মার্চের শেষের দিকে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রথম সফরকালে আবার ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বরে লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এ প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপনের চেষ্টা করলে তা ছাত্রদের আবেগ-অনুভূতিতে আরেকদফা ঘা দেয়। জনসভায় এমন প্রবল প্রতিবাদ ওঠে যে, লিয়াকত আলী খান তার বক্তৃতা শেষ করতে পারেননি। এ সময় আয়োজিত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী এক জনসভায় উর্দুর পক্ষে মূখ্য ভূমিকা নিয়ে তিনি আরেকবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তার এই বিবৃতি প্রদেশব্যাপি ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটায়।

এ অবস্থায় রাজনীতিবিদদের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলনে যোগাদানের প্রস্তুতি নেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয় এবং সেদিন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ নম্বর ধারা লংঘন করা হয়।[৪] পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে ২২ ফেব্রুয়ারি পরিস্থিতি এক পরিপূর্ণ গণআন্দোলনের রূপ নেয়। এতে করে বাংলা ভাষার আন্দোলন আর কেবল শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি শ্লোগান কিংবা কতিপয় রাজনীতিবিদদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার উপলক্ষ হয়ে রইলো না। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থীদের প্রভাবাধীন নেতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে বহু ছাত্র ও যুবক সক্রিয় কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসে এবং দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কমিউনিস্টরা 'পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন' নামে তাদের ছাত্রসংগঠনের গোড়াপত্তন ঘটায়। যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যকার আদর্শগত পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ

৪। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ নং ধারা বলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট চারজনের অধিক লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন। মোহাম্মদ তোয়াহা এবং অলি আহাদের নেতৃত্বে বামপন্থী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

উদারপন্থীদের সমর্থন লাভকারী হিসেবে দেশের একমাত্র বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে বহাল থাকলেও কমিউনিস্টরা তাদের নিজেদের চিন্তাধারা প্রসূত ভিত্তিসংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে।

ছবি : প্রথম শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের উপর ব্যাপক গণসমর্থন পাকিস্তানের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে একটি ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, বাংলাকে অবশ্যই দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় খসড়ায় নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের এটা ছিলো অন্যতম প্রধান কারণ। পাকিস্তান সরকারের উর্দু ভাষাভাষী ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং যেকোন উপায়ে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকাশের পথকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য তাদের কূটপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শেষ সাংবিধানিক সুপারিশে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের বিষয়টিতে মোটামুটিভাবে একটি ঐক্যভিত্তিক সম্মতি আদায় করা সম্ভব হয়।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রথম নির্বাচন (১৯৫৪): ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তিনজন প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে সংগঠিত নির্বাচনী জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে জয়লাভের কয়েক মাসের মধ্যে এই ঐক্যজোট ভেঙ্গে গেলেও উক্ত কর্মচারী দেশের পরবর্তী রাজনীতিতে এক সুদূঢ়প্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে এবং ৩ এপ্রিল এ কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলা প্রদেশে সর্বপ্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করে।

২১ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের সংগ্রামে সমানাধিকারের সনদ হিসেবে পরবর্তীকালের রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয়করণ এবং কৃষি উৎপাদকদের ন্যায্যমূল্য স্থিতিকরণের মতো কতিপয় নতুন দাবীর সংযোজন নয়া ঐক্যজোট বামপন্থীদের প্রভাবের পরিচয় দেয়। শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ছাড়াও স্বায়ত্তশাসনের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি ছিলো কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র দফতর ও মুদ্রাব্যবস্থা এই তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবীটি উল্লেখিত ছিলো। ২১ দফা কর্মসূচি হয়ে পড়ে গত ৭ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমলীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের চরম অসন্তোষর বহিঃপ্রকাশ। এই কর্মসূচি আরো সুস্পষ্টভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে, যা দেশের ৯০ শতাংশ নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন অর্জন করে।

দ্বিতীয় গণপরিষদ: ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর গণপরিষদ তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হারিয়েছে। সে মাসে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের সেই অংশে কোনো নির্বাচিত সরকার রইলো না। যুক্তফ্রন্ট বিলুপ্ত হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের অবস্থান কিছুটা উন্নত হতে পড়ে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ছিলো প্রায় স্থবির। পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন বলবৎ থাকা অবস্থায়ই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার যোগদানের পর সোহরাওয়ার্দী এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসনের

গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন প্রতিনিধি নিয়ে ৮০ সদস্যের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করা হয়। সংখ্যা সাম্যনীতি রক্ষা করা হয় নিম্নরূপ বিভাজনের ভিত্তিতে—

প্রতিনিধি	**সদস্য সংখ্যা**
মুসলিম লীগ	২৬
যুক্তফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১৩
নূন গ্রুপ	৩
পাকিস্তান কংগ্রেস	৪
সংখ্যালঘু ফেডারেশন	৩
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	২
স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ	১
অন্যান্য	১২
মোট	**৮০**

পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন মাত্র মুসলিম লীগ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলিম লীগ এই একজন মাত্র সদস্যকেই গণপরিষদে পাঠাতে সক্ষম হয়। যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ট পার্টি থাকলেও তাদের কেউই গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রাক্কালে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক মারী চুক্তি যা পরিষদের অধিবেশন চলাকালেও অব্যাহত থাকে। পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে অংশ প্রদান এবং পূর্বাঞ্চল থেকে গভর্ণরের শাসন প্রত্যাহার করার শর্তে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপর সমর্থন প্রদান করে। সর্বস্তরে সংখ্যাসাম্য নীতি এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এ সময় মীমাংসিত বিষয় বলেই ধরে নেওয়া হয়। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মূল প্রশ্নটি থেকে যায় অমীমাংসিত।

সংবিধান ও ১৯৫৬ সাল: ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। দেশ তখন থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়নের পথে তার পদযাত্রা শুরু করে। সংবিধানে মানবাধিকার সনদে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত করা হয় এবং বাংলাভাষা দুটি রাষ্ট্রভাষার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছিলো একটি অবৈধভাবে গঠিত গণপরিষদের মাধ্যমে এবং এতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আসেন নি। যে প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে মনে হয় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির দিন থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শীঘ্র হোক আর বিলম্বে হোক, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্য তারা প্রথম থেকেই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ ছিলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রায় অনুরূপ। ফেডারেল আইন সভার তালিকায় সংরক্ষিত আইটেমের সংখ্যা ৫৯ থেকে ৩০টিতে কমিয়ে আনা হলেও মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো করে নেওয়া হয়েছিলো আরো কেন্দ্রীভূত (১০৬ নং অনুচ্ছেদ)।

৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দের উপর পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অংশ ছিলো না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমনকি প্রদেশভিত্তিক বাণিজ্যসহ আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তানির গোটা অধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয়া হয়। প্রাদেশিক তালিকা ৫৪ থেকে ৯৪ টিতে বাড়ানো হলেও সেগুলোর বেশিরভাগই ছিলো গুরুত্বহীন আইটেম, যার ফলে ক্ষমতা এবং রাজস্বের উৎস্য বিচারে নতুন সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে কোনো উন্নতি ঘটেনি।

প্রেসিডেন্টকে করে তোলা হয় দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। জাতীয় পরিষদে এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবর্গ সমবায়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে (৩২নং অনুচ্ছেদে) সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্ত্রীসভা এবং জাতীয় সংসদের উর্দ্ধে অবস্থান করতেন। ফেডারেল ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থেকে (৩৯নং অনুচ্ছেদ) এবং 'প্রধানমন্ত্রী'র নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রীবর্গ সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রীসভা ছিলো 'প্রেসিডেন্টকে তার কর্মসম্পাদনে সাহায্যকারী ও পরামর্শদানকারী।' প্রেসিডেন্ট তার ইচ্ছানুযায়ী একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতেন যিনি 'তার বিবেচনায়'

জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'নিযুক্ত' এবং অপসারিত হতেন। যদিও মন্ত্রীসভা সমষ্ঠিগতভাবে জাতীয় পরিষদের কাছে দায়িত্বশীল ছিলো তথাপি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সন্তুষ্ঠি অর্জন অবধি স্বীয়পদে বহাল থাকতে পারতেন। ৩৭(৭)নং অনুচ্ছেদ বলে যদিও বলা হয়েছিলো যে, প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে কাজ করবেন, বাস্তবে অবস্থা ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

উপযুক্ত সকল ক্ষমতার সমন্বয়ে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের পদ পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকচক্র ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে যোসাজশ ক্রমে তাদের প্রত্যাশিত ক্ষমতা পেয়ে যায়, যার অবস্থান হয় শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক ফেডারেল ব্যবস্থায়। 'শক্তিশালী কেন্দ্রের' প্রবক্তারাও স্বায়ত্তশাসনবাধীদের ধারায় একটি যুক্তি দেখাতে শুরু করেন। তাদের মতে পাকিস্তানের বাকী অংশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব, সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলো, তাতে করে 'মিল্লাত' বা একাত্মবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক পাকিস্তানই ছিলো একমাত্র সমাধান।

একাত্মবাদ অর্থ ছিলো এক আল্লাহ, এক দেশ, এক সরকার, এক জনতা, এক ভাষা এবং অবশ্যই এক নেতা, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট। এ ধারণার একজন প্রবক্তা, পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী এ কে ব্রোহী যুক্তি দেখান যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক ব্যবধান না থাকলেই বরং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু পারস্পরিক এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠে পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে ঐক্য বিধান করতে গিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানে শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিকল্প ছিলো না। এই বক্তব্যে কেবলমাত্র পাকিস্তানের দুই অংশে অবস্থানরত দু'ধরনের জনগণের সমঝোতাবিহীন সম্পর্ক এবং তার পেছনে বিরাজমান প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে ধারণার অভাবই প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বাঙ্গালীদের আকাঙ্খিত গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সাল অবধি প্রভাব বিস্তারকারী মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা আর আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকার যুক্তি খুঁজে পেলেন না, ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া না হলে এবং প্রদেশে গভর্ণরের শাসন জারি না হলে এর আগেই দলটি বিভক্ত হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এসব ঘটনার ফলে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার অবকাশ ছিলো। কতিপয় আন্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিস্ট কর্মী ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগকে তাদের প্রকাশ্য সংগঠক হিসেবে ব্যবহার করে মওলানা এবং তার অনুসারীদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের রাস্তা ধরে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটিই ছিলো বামপন্থীদের প্রভাব ও উদ্দ্যেগে গৃহীত আওয়ামী লীগের সর্বশেষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় যোগদানের পর এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে বলে বিবৃতি দানের পর তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত ব্যাপক ক্ষোভের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের মধ্যকার বিভক্ত এক প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। আন্তর্জাতিকভাবে সোয়াটো ও সেন্টোর সামরিক চুক্তির প্রতি সোহরাওয়ার্দীর খোলাখুলি সমর্থন দান ছিলো ২১ দফা কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুত পাকিস্তানের জোটনিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক ধরণের গুণগত পরিবর্তন আসে এবং তা নতুন আকার নিতে শুরু করে আওয়ামী লীগের ভাঙন সাময়িকভাবে ক্ষমতাসীন শ্রেণির হাত শক্তিশালী করে তুললেও এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন বড় রকমের হোঁচট খেলেও পাকিস্তান একটি লিখিত সংবিধানের অধীনে ক্রমশঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তাবিত নির্বাচন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মহলে এক বাস্তব ভীতির সূচনা ঘটায়। বারো বছরে অবস্থান সংহতকারী ও সম্পদ আহরণকারী আমলা, সেনাবাহিনী, নব্যপুঁজিবাদী ও সামন্ত এলিট সকলের কাছেই ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত নির্বাচন ছিলো একটি হুমকি, বিরাট ধরনের শংকা। সে কারণে তারা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বানচাল করার ষড়যন্ত্রে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

প্রথম সামরিক আইন: শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাকিস্তানের ফেডারেল আদালত বিচারকদের অবদান-সমৃদ্ধ ঘটনায় প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর থেকেই বেআইনী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আরেক অবৈধ প্রক্রিয়ায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক আইন ঘোষণা করেন। এভাবে আইউব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে নেন ও এই প্রক্রিয়াকে একটি

রক্তপাতহীন বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন হিসেবে পাকিস্তানকে সফল করে তোলার প্রধান দুটি উপাদান স্বায়ত্তশাসন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারীত্বের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার, দৃশ্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

একনায়কতান্ত্রিক প্রক্রিয়াধীনে দুর্নীতি অপ্রতিহত গতিতে অব্যাহত রয়েছে এবং জাতীয় সম্পদ কেন্দ্রিভূত হয়েছে মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে। মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকায় এবং রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ থাকায় জাতীয় আরো কমসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এ সময় রাজনৈতিক ক্ষমতায় বাঙালিদের কোনো অংশ না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণের প্রক্রিয়া এক চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। আইউবের 'প্রবৃদ্ধিমুখী অর্থনীতি' ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে দরিদ্রতর করে তোলে। এ সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। আইউবের শাসনকালে দেশে বিখ্যাত '২২ পরিবার' গড়ে ওঠে। এদের সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং এদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো ৮০ শতাংশ ব্যাংক ব্যবসায়, ৯০ শতাংশ বীমা ব্যবসায় এবং ৬০ শতাংশ শিল্প সম্পদ।

সামরিক আইন জারীর সঙ্গে সঙ্গে মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। নির্মম সামরিক প্রশাসনাধীনে প্রায় চার বছরে দেশে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ পরস্পরের সাথে শাসনতান্ত্রিক রাজনীতিতে ঘোর কলহে লিপ্ত থাকায় আইউবের ব্যক্তি স্বাধীনতাবিহীন শাসনামল জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে তাদের অবস্থান সংহতকরণে সহায়তাও করে, যা অন্য সময়ে অত্যন্ত কঠিন ছিলো। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। কোনো বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এই আইউব খানকে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের ক্ষমতা দেয়।

১৯৬২ সালের সংবিধান: পাকিস্তানে সংসদীয় সরকারের ব্যর্থতার কারণ নিরূপন এবং দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ণের নির্দেশ দিয়ে ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আইউব খান একটি শাসনতান্ত্রিক কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসে যে, সংসদীয় প্রক্রিয়া পাকিস্তানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কমিশন প্রদত্ত ৩টি যুক্তি হলো:

১। যথাযথ নির্বাচনের অভাব এবং সংবিধানে ত্রুটি;
২। মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক দলসমূহের উপর রাষ্ট্রপ্রধানদের অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ এবং প্রাদেশিক সরকার প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি;
৩। সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলসমূহে নেতৃত্বের অভাব, রাজনীতিবিদদের চরিত্রহীন এবং প্রশাসনে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ।

কমিশন তার সুপারিশমালায় প্রস্তাব করে যে, পাকিস্তানে ফেডারেল কাঠামো বহাল থাকা উচিত, তাতে একই সময়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানও বাঞ্ছনীয়। একনায়ক সরকারের ন্যায় আইউব খান সুপারিশমালার যেসব প্রস্তাব তার স্বার্থানুকুলে ছিলো সেগুলো গ্রহণ করে বাকীগুলো বাদ দিয়ে দেন। তিনি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত হাউস অব পিপলের ধারণাভিত্তিক দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা এবং ভাইসপ্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ধারণা বাতিল করে দেন। ফেডারেল কাঠামো বাদ দিয়ে ১৯৬২ সালের কেন্দ্রতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামো সংযোজন শাসনতন্ত্র কোনোটাই উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি এবং রাজনীতিবিদেরা উভয়কেই 'অগণতান্ত্রিক' বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে গেলে কিংবা অধিবেশনে না থাকলেও প্রেসিডেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারতেন (অনুচ্ছেদ ২৯)। কেন্দ্রীয় সরকার প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে প্রাদেশিক বিষয়ে যেসব প্রশাসনিক ও নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন সেসব ছাড়াও সংবিধানের ৩০ (খ) অনুচ্ছেদ বলে প্রেসিডেন্টকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেয়া হয়। আইনসভার পরিবর্তে নির্বাহী বিভাগের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়টি ছিলো ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের আরেকটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদ বলে প্রেসিডেন্টকে জাতীয় পরিষদের বার্ষিক বাজেট পেশ করার পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাতে বিভিন্ন খাতের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করা হলেও নেতিবাচক ভোট প্রদানের কিংবা প্রত্যাখানের ক্ষমতা পরিষদের ছিলো না।

পাকিস্তানে নব অধিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর নীতিমালা এবং মনোভাবের প্রেক্ষাপটে বাঙালিরা এক নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হন। দেশ বিভক্তির পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন দাবী অপূর্ণ থাকায় তারা ভোগছিলেন নিদারুণ হতাশায়। সর্বপ্রথম যে

রাজনীতিকসচেতন গ্রুপটি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের প্রস্তাব নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন সেটি ছিলো ইংল্যাণ্ডে অধ্যায়নরত বামপন্থী ছাত্রদের একটি সংগঠন। 'উত্তরসুরী' নামক একটি সংগঠন থেকে উদ্ভুত উপযুক্ত ছাত্ররা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান নামে একটি প্রকাশ্য সংগঠনের গোড়াপত্তন ঘটান। যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাঙালি সম্প্রদায়ের অর্থানুকূলে তারা উত্তর লণ্ডনের হাইব্যরি হিল-এ একটি ভবন ক্রয় করে তার নামকরণ করেন 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'। এই হাউসকে কেন্দ্র করে অন্যান্য রাজনীতিক সংগঠনগুলো সংগঠিত হতে শুরু করে এবং অচিরেই তা দেশে বিদেশে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই সংগঠন সৃষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'অসুখী পূর্ব বাংলা' শীর্ষক প্রথম প্রচারপত্র। সংগঠনটি ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট আইউবের কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য সফরকালে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা আন্দোলন' এর নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এই সংগঠনের কতিপয় সক্রিয় কর্মীকে তাদের বিদেশে শিক্ষা সমাপ্তির অনেক বছর পরেও দেশে আসার অনুমতি দেওয়া হয় নি।[৫]

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়নের প্রেক্ষিতে মওলানার নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা আইউবকে সমর্থন জানাতে এবং এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অর্জিত সুদৃঢ় অবস্থান থেকে সরে আসেন। এসময় বাঙালিকে নেতৃত্ব দেবার একমাত্র ব্যক্তি রইলেন সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন 'জাতীয় নেতা' এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আইউব খানের শাসনতন্ত্র জারি হবার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের প্রতিনিধিত্বকারী শাসনতান্ত্রিক নেতা হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ম্লান হয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালে চিকিৎসার্থে লণ্ডন যান। একই বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রিয় নেতার দেখাশোনা ও নির্দেশ গ্রহণের জন্য লণ্ডন আসেন। এসময় 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হয়। নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দলের অন্য কারো চেয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য বেশি প্রতিশ্রুতিশীল।

ইতিমধ্যে বাঙালিদের সম্পদ শোষণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের দুই অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য চরমে ওঠে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে বাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতা বোধে আক্রান্ত হলে বঞ্চনাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বাঙালিরা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, ভারত যেকোন মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে। দেশের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনে পূর্ব পাকিস্তান বৃহদাংশ অবদান রাখলেও যুদ্ধের সময় এ অঞ্চলকে ভারতের অনুকম্পায় ছেড়ে দেওয়া হয় যদিও কৌশলগত কারণেই ভারত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করেনি। কিন্তু বাঙালিরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠেন যে, ৯৫ শতাংশ জাতীয় বাজেট পশ্চিমাঞ্চলের অনুকূলে বরাদ্দ করে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চাকুরী, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির অর্থনৈতিক সুবিধা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

পূর্ব পাকিস্তানে এসময় জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো ক্রমশঃ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৯৫৪-৬৪ সালে মিস ফাতেমা জিন্নাহর অনুকূলে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের মধ্যে আইউবের শাসনতন্ত্র ও সরকারবিরোধী মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বাঙালি মধ্যবিত্তের নাস্তার টেবিলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি 'অবিচার' ছিলো আলোচনা ও ক্ষোভের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রাদেশিক ক্যাডারভুক্ত বাঙালি অফিসার, কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী সকলেই ছিলেন এই আলোচনার অংশীদার। বাঙালি সি এস পি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইতোমধ্যেই আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবি তাদের ত্বরিত লাভের সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন জোরদার হওয়ার অর্থ ছিলো তাদের ত্বরিত প্রমোশন, বেতনবৃদ্ধি, ব্যবসায়ের লাইসেন্স এবং বরাদ্ধ বৃদ্ধি।[৬] কাজেই আন্দোলন পরিচালনাকারী ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনীতিবিদরা আইউবের শাসনামলে উদ্ভুত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে প্রাথমিক সমর্থন লাভ করতে থাকেন।

৫। মওদুদ আহমদ ('বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা' গ্রন্থের লেখক) ১৯৬৬-৬৭ সালে এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তাকে শিক্ষা শেষে দেশে না ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলো।

৬। পুলিশের হাতে আসাদ নামক ছাত্রনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে নিহত হলে পাঁচজন বাঙালি বেসামরিক অফিসারকে কেন্দ্রে সচিব হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

ছয়দফা আন্দোলন ও ১৯৬৫ সাল: ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সকল দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা কর্মসূচিও প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইউব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধীতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিলো, সেখানে (৬-৬-১৯৬৬ তারিখে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। উক্ত কনভেনশনে মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থী দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিলো। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। ২১ জনের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের অপর চার জন নেতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলনস্থান ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি উপস্থাপন করেন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে। ওই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এই দাবিগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অবগত ছিলেন না। বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন নেওয়া তো দূরের কথা- কমিটির সামনে তা পেশই করা হয়নি। ফলে অনেক নেতা-কর্মী ক্ষুদ্ধ হন এবং অনেকে হন বিভ্রান্ত। তবে ছয়দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। প্রবীণ নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ৬ দফা', 'বাঁচার দাবি ৬ দফা', '৬ দফার ভেতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত'-ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। কেবল তা-ই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি" শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়। এই পুস্তিকায় ৬ দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এখানে দাবিগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

প্রথম দফা: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি- ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার ফেডারেশন ধরনের সংবিধান রচনা করতে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।

দ্বিতীয় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা- দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

তৃতীয় দফা: মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা- (১) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুটো স্টেট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে। (২) দুই অঞ্চলের কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দুই মুদ্রা থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চতুর্থ দফা: কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা- সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ ফেডারেশন তহবিলে জমা হবে।

পঞ্চম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা- এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ করা হয়:

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে;
(২) রাজ্য সরকার নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের এখতিয়ারে রাখবে;
(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সমানভাবে বা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হবে;
(৪) দেশে উৎপাদিত পণ্য বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানী হবে;
(৫) বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানির অধিকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা: আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা- পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করার জন্য ক্ষমতা দিতে হবে।

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মাওলানা তর্কবাগীশ এবং আরো কিছু প্রবীণ নেতা ছয়দফার বিরোধীতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধীতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান দলের ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, পাক-ভারত যুদ্ধের পর এটা পরিস্কার হয়েছে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এর উভয় অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করলেই যে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে- এমনটি ঠিক নয়। বরং একটি যুক্তরাষ্ট্রের সকল ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করতে পারলেই উক্ত রাষ্ট্র শক্তিশালী হবে। সুতরাং পাকিস্তানের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং এর উভয় অংশের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি একটি সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। এই দাবিকে সাংগঠনিক রূপ দেয়া ও দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারা দেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচার শুরু করেন। ছয়দফা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতে করে আইউব-মোনেম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় জেল-জুলুম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানেই জনসভা করতে যান, সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। একটা মামলা দায়ের করা হয়, আবার জামিনও দেয়া হয়। ৬ দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮মে ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২ টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সময়সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ছয়দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন। ফলে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন আরো জোরালো হয়ে ওঠে।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বরাবরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯৬৬ সালের ১২ জুন তিনি ছয়দফার বিপরীতে চৌদ্দদফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যা মূলতঃ ছয়দফারই বর্ধিত রূপ। ভাসানী ছিলেন চীনাপন্থী। আইউব খান যখন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন তখন থেকেই ভাসানী আইউবের প্রতি নরম হতে শুরু করেন। তাছাড়া আইউব খান মওলানার 'ইসলামী সমাজতন্ত্রের' পক্ষে কথা বলতে আইউব-ভাসানী সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটে।

১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়। এক অংশের নেতৃত্বদের রাশেদ খান মেনন ও অপর অংশের নেতৃত্ব দেন মতিয়া চৌধুরী। ন্যাপ ভাঙ্গে ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর। এই দিনে মাওলানা ভাসানী রংপুরে ন্যাপের কাউন্সিল সভা আহ্বান করেন। কিন্তু ন্যাপের ছয়দফা সমর্থনকারী অংশ এই কাউন্সিল বয়কট করে। এই অংশে ডিসেম্বরের ১৬ ও ১৭ তারিখে ঢাকায় একটি রিকুইজিশন কাউন্সিল সভা আহ্বান করেন এবং এই সভায় মাওলানা ভাসানীকে ন্যাপের সভাপতির পদ থেকে বহিস্কার করা হয়। একটি অংশ ন্যাপ (ভাসানী) ও অপর অংশ ন্যাপ (রিকুইজিশনিস্ট) নাম ধারণ করে। প্রথম অংশের নেতা হন মাওলানা ভাসানী এবং পরের অংশের নেতা হন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়অ গ্রুপ), ন্যাপ (ওয়ালী) এর সঙ্গে এবং ছাত্র ইউনিয়ন (রাশেদ খান গ্রুপ) ভাসানী ন্যাপের ছাত্রসংগঠন রূপে সম্পৃক্ত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিস্কার করে। আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধ্বংস করা এবং আইউব-বিরোধী রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি ছিলো এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। একে 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সরকার ৬ জানুয়ারি (১৯৬৮) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ষড়যন্ত্র উদঘাটনের কথা ঘোষণা করে। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা ও দুইজন বাঙালি সিভিল কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জানুয়ারি (১৯৬৮) আরেকটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকেও উক্ত মামলার আসামী বলে ঘোষণা করা হয়।

ছবি: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তিনি তখন জেলে বন্দি ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এই ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা ১৯ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে ধর্মঘট আহ্বান করে। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভায় 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দাবি' করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকেই ঘোষণা করেন, কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছে। এমনকি তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্য নন এমন কিছু বিরোধী দলীয় সদস্যও আগরতলা ষড়যন্ত্রকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে উক্ত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

ছাত্র আন্দোলন ও এগারো দফা: ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আইউব বিরোধী আন্দোলন করতে ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপের মধ্যে তখন কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপক সমর্থন ছিলো। কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলে। এই দুই সংগঠন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে। উক্ত ১১ দফা দাবি ছিলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র স্কুল কলেজ স্থাপন ও বেসরকারি স্কুল কলেজের অনুমোদন, ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস, হল ও ক্যান্টিন খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' প্রদান, মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা, অফিস-আদালতে বাংলা বিভাগ চালু, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রসার, যানবাহনে ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেশনে' টিকিট প্রদান, চাকুরির নিশ্চয়তা বিধানসহ কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেন্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাক-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬। কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মুকুব করতে হবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মুজুরি-বোনাস এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী নিয়ম-কানুন প্রত্যাহার এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করতে হবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল শ্রেণির নাগরিককে অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এগারো দফা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে সমর্থন লাভ করে এবং আইউব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র-নেতৃবৃন্দের হাতে চলে আসে। যেহেতু মোজাফফর পন্থী ন্যাপ ও ভাসানী-পন্থী ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্টই যৌথভাবে এগারো দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে, সুতরাং উপরিউক্ত তিনটি রাজনৈতিক দল তা সমর্থন করে।

আইউব বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯ এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৪৪ ধারা জারি করে কিংবা সান্ধ্য আইন জারি করে, কিংবা শত শত নেতা কর্মীকে ধরপাকড় করেও আন্দোলনকে থামানো যায়নি। এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানী নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১ জন স্কুল শিক্ষক অন্যতম।

আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে শতকরা ৭৫ ভাগ সে আহ্বানে সাড়া দেন। পল্লী এলাকায় অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিদ্রোহী জনতা হত্যা করে। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন ১৮ ফেব্রুয়ারি। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় এবং এখানেই 'জয় বাংলা' শ্লোগানের উদ্ভব ঘটে। সভায় 'বঙ্গবন্ধু' ছয়দফা ও এগারোদফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আলাপ-আলোচনার পর আইউব খান মাত্র দুটি মাত্র বিষয় মেনে নেন— (১) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। আইউব খান বৈঠকের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' বলে মন্তব্য করেন। জামায়াতে ইসলামী একে 'সফল' বলে অভিহিত করে। হামিদুল হক চৌধুরী একে 'জনমতের বিজয়' বলে উল্লেখ করেন। এমনকি মাওলানা ভাসানীও এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **DAC** থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে নেন। মোজাফফর ন্যাপও তাঁকে অনুসরণ করে। ফলে ১৪ মার্চ **DAC** ভেঙ্গে যায়। ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে জামায়াতের নেতৃত্বে 'ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ' গঠন হয় এবং তারা ৬ দফা ও ১১ দফা বিরোধী প্রচারাভিযান শুরু করে। ইতিমধ্যে ২১ মার্চ (১৯৬৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার আলোকে পাকিস্তান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইউব সমীপে পেশ করলে আইউব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ উক্ত খসড়া নীতি পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর অঞ্চলগুলির ব্যাপক সমর্থনের ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এই ইউনিট ভেঙ্গে চারটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আইউব-বিরোধী গণআন্দোলন

কেবল পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমতবস্থায় স্বৈরাচারি আইউব তার ক্ষমতা জনগণের নির্ধারিত প্রতিনিধিদের হাতে না দিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৬৯ তৎকালীন পাকসেনা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ফলে আইউবের পতন ঘটলেও তাদেরই স্বার্থে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচন: ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশের বৈশিষ্ট্য ছিলো নিম্নরূপ:

১। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, মহিলারা সাধারণ আসনে ও নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রদেশসমূহের মধ্যে সদস্যসংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা হবে—

প্রদেশের নাম	**সাধারণ**	**মহিলা**
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	০
মোট	**৩০০**	**১৩**

২। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে যার সদস্যসংখ্যা নিম্নরূপ:

প্রদেশের নাম	**সাধারণ**	**মহিলা**
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	**৬০০**	**২১**

৩। জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৪। জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৫। ২৫ বছর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানী নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিস্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি কেউ হন তবে তাকে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল ঘোষণার মধ্যে একটি আসন রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছেড়ে দিতে ব্যর্থ হলে তার নির্বাচিত সবগুলি আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

৭। কোনো সাংসদ স্পিকার বরাবর স্বহস্তে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। সংসদ সদস্য স্পিকারের নিকট থেকে ছুটি না নিয়ে একাদিক্রমে পনেরোটি কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে। কোনো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সাতদিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ শূন্য বলে গণ্য হবে।

৮। জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তার পছন্দমতো দিন, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের সভা করবেন। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারবেন।

৯। জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করবেন। পদ শূন্য হলে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ অন্য আরেকজন সদস্যকে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার পরিষদের সদস্যপদ হারালে, পদত্যাগ করলে বা ২/৩ অংশ পরিষদ-সদস্যদের আস্থা হারালে তার পদ শূন্য হয়ে যাবে।

১০। জাতীয় পরিষদের কোনো অধিবেশনে ১০০ জনের কম সদস্য উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অধিবেশন স্থগিত রাখবেন।

১১। সদস্যরা পরিষদে বাংলা, উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবেন। পরিষদের কার্যবিবরণী সরকারী রেকর্ড উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজিতে রক্ষিত হবে।

১২। শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনকাঠামো আদেশ কতগুলো মূলনীতি উল্লেখ করে দেওয়া হয়। যেমন—

- জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ এবং ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
- মামলা-মোকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হয়।
- আইন তৈরী সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সবরকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।
- নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সবরকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ও প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সবরকম বৈষম্য দূর করা হয়।
- শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে, পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন এবং সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্মপালন ও সবরকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারেন।

১৩। ইয়াহিয়া খান ঘোষিত "আইন কাঠামো আদেশ" এর উপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হয় যে, এই আদেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামাত-ই-ইসলামি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়।

১৯৭০ এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে জনসংখ্যা ছিলো সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য ১৩টি। এর মধ্যে পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো সাধারণ ১৬২ এবং মহিলা ৭টি। ১৬২ টি আসনের জন্য দরভিত্তিক প্রার্থীসংখ্যা ছিলো নিম্নরূপ:

দল	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	৯৩
মুসলিম লীগ (কাউয়ুম)	বাঘ	৬৫
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৫০
জামাতে ইসলামী	দাঁড়িপল্লা	৬৯
জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামী	বই	৪৫
জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ	১৩
শর্ষিনার পীরের ইসলামিক গণতান্ত্রিক দল	গাভী	৫
পাকিস্তান দরদী সংঘ	গরুর গাড়ী	১
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	হুঁকা	৩
ন্যাপ (ভাসানী)	ধানের শীষ	১৫
ন্যাপ (মোজাফফর)	কুঁড়েঘর	৩৬
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল	১৩
বেলিচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার	১
পিডিপি	ছাতা	৮১
জাতীয় গণমুক্তি দল (সংখ্যালঘু)	মোমবাতি	৪
জাতীয় কংগ্রেস (সংখ্যালঘু)	কলম	৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী		৪
মোট		**৭৬৯**

উপরের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায়, আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দলই পূর্ব পাকিস্তানে সব কয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি।

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যার ফলে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর। অন্যদিকে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে দুই লক্ষ লোক মারা যায়।

এই ঘূর্ণিঝড়ে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাব নতুন করে প্রমাণ করে। এসময় বিভিন্ন দল নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানালেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার দৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং দুর্গতদের প্রতি পাকিস্তানী সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন। অবশেষে পূর্ব ঘোষিত সময় অনুসারেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নুরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে

আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। সংগঠনের দিক থেকে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি উভয়েই ছিলো আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলো আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এই বিপুল রায় ছিলো প্রকারান্তরে ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। এই গণরায় ছিলো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ব বাংলাবাসীর ম্যাণ্ডেটস্বরূপ। দুই প্রদেশের দুটি দল প্রাধান্য লাভ করায় পাকিস্তানে নির্বাচত্তোর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হওয়া মাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন: I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our six-point programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitutions except one which is based on the six-point programme.

পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করে। ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। এতে বলা হয়, তিনটি লক্ষ অর্জন করার জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে। লক্ষ্যগুলো হলো:

১। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ্য কায়েম করতে হবে।

৩। স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

ইশতেহারে নিম্নলিখিত শ্লোগান উচ্চারণের আহ্বান জানানো হয়—

'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ- দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দূর্গ কর- মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালি অস্ত্র কর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও- বাঙ্গালিরা এক হও।' ২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন। অগত্যা ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ২৫ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আহ্বান করেন। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। আলোচনার অন্তরালে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করে।

এমনি প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা 'বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ' নামে পরিচিত। এই ভাষণের মাধ্যমে দুটো উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে—

১। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম- এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

২। এই ভাষণের মাধ্যমে ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়:

- অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;
- সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;
- প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে;
- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ছবি: রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

২৫ মার্চের কালোরাত ও স্বাধীনতা ঘোষণা: ১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬-১৭ মার্চ পর্যন্ত মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন ও আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় ভুট্টো কিছুতেই ছয়দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিলো না, শেখ মুজিবও ছয়দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। ইতিমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার কালক্ষেপণ করে অলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সরঞ্জমাদি আনা হয়। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতের পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাক-সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। পাক-বাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চে প্রথম প্রহর) শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে সেখানে তাঁকে মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দি রাখা হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল।

ছবি: গণহত্যা ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করে। বাণীটি নিম্নরূপ:

> "This may my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of ocupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[৭]

২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। পাক-সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে দীর্ঘ নয় মাস। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ নয় মাস: ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর যে গণহত্যা শুরু করে তার প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় ইপিআর, সেনাবাহিনী, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ান ও অফিসারবৃন্দ। দেশের বিভিন্ন অংশে সে সময় যে সকল সামরিক অফিসার প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:

মেজর জিয়াউর রহমান- চট্টগ্রাম অঞ্চল
মেজর রফিকুল ইসলাম- নোয়াখালী অঞ্চল
মেজর খালেদ মোশাররফ- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরববাজার, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সিলেট অঞ্চল
মেজর একেএম সফিউল্লাহ- ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল
মেজর আবু ওসমান- কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল
মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ- রাজশাহী অঞ্চল
মেজর নাজমুন ও মেজর নওয়াজেশ- সৈয়দপুর ও রংপুর অঞ্চল।

দেশের সকল স্থানে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দর নেতৃত্বে ২৬ মার্চ থেকেই প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মাঠে সশস্ত্র টেনিং ক্যাম্প চালু হয়। বড়ো বড়ো গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়, ব্রিজ-কালভার্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। অনেক যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে, অনেকে সীমান্ত এলাকায় যুব শিবির স্থাপন করে যেখান থেকে অনেককে মুক্তি বাহিনীর জন্য রিক্রুট করা হয়। প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালীন তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সীমান্ত

৭। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে (পৃ-১)।

অতিক্রম করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। মিসেস গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের পর তাজউদ্দীন আহমদ সরকার গঠন করেন যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা লাভ করা যায়। আগরতলাতে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করা হয়:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম- ভাইস প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমদ- প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমেদ- পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ এইচ এম কামারুজ্জামান- অভ্যন্তরীণ সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী- অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

মন্ত্রীপরিষদ ১২ এপ্রিল কলকাতায় ফিরে যায়। মন্ত্রীপরিষদের সামনে দুটি কাজ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রথমত, স্বাধীনতার সনদ প্রণয়ন এবং দ্বিতীয়ত, মুক্তাঞ্চলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। মুক্তাঞ্চলে এবং একই সঙ্গে নিরাপদ ও কলকাতার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ আছে এমন একটি স্থানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকানন নির্বাচন করা হয়। ১৭ এপ্রিল তারিখে দুপুর ১১টায় বৈদ্যনাথতলায় মন্ত্রীসভার অভিষেক অনুষ্ঠান হয়।

ছবি: মুজিবনগর সরকার

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান। নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আওয়ামী লীগের চিপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। নবগঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাম হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতায়। বৈদ্যনাথ তলায় এই সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামেই পরিচিতি লাভ করে ১৪ এপ্রিল (১৯৭১) মুজিবনগর সরকার কর্তৃক কর্ণেল ওসমানীকে 'মুক্তিফৌজ'- এর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষ রাজনৈতিক আর্দশভিত্তিক এবং ব্যাক্তির নামভিত্তিক কিছু বাহিনী গড়ে উঠেছিলো। যেমন- মুজিব বাহিনী, টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জার বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, পিরোজপুরের রফিক বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস মোল্লা ও শিক্ষক আব্দুল গফুর বাহিনী, ময়মনসিংহের অবসরপ্রাপ্ত জুনিয়র কমিশন অফিসার আফসার বাহিনী, সুবেদার আফতাবের বাহিনী উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে প্রবাসী সরাকের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রর মূল লক্ষ্য ছিলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও সমর্থনকারী সকলকে উজ্জীবিত করা এবং উজ্জীবিত রাখা, সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ব্যাপারে সকলকে আশান্বিত করা। এ লক্ষ্যেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় গণমাধ্যম হিসেবে মূল্যবান অবদান রেখেছে মুজিবনগর এবং বিভিন্ন মুক্তঞ্চল, যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে প্রকাশিত পত্র-প্রত্রিকা। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্বে ছাত্র-সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিলো

গৌরবোজ্জল। জনমত গঠন, কূটনৈতিক তৎপড়তা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-প্রত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া যোদ্ধা হিসেবে, মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারী রূপে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ছবি: মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী মুক্তিসেনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাস ভারত তাদের ভরণ-পোষণ করে। কেবল শরণার্থীদের জন্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতকে ব্যয় করতে হয়েছে ২৬০ কোটি টাকা। যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলো তার জন্ম হয় ভারতের মাটিতে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে ভারতীয় মাটিতে। অবস্থান করেছে কলকাতায় এবং নয়মাস সরকারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এজন্য সকল অবকাঠামোগত সাহায্য প্রদান করেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি কেবল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বিশ্বজনমত গঠন করা, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় করা ইত্যাদি কাজ ভারত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী নিয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছেই ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পন করে। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতের ভুমিকা ছিলো প্রত্যক্ষ, গভীর এবং ঘনিষ্ঠ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার অন্তনিহিত তাৎপর্য: পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই রাষ্ট্রভাষার বাংলা ভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, তাতে পূর্ব বাংলা প্রদেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে এমন ধারণা জন্ম লাভ করে যে তাদেরকে কখনোই রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার দেওয়া হবে না প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙালিরা অধিকার সচেতন হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলি তাদেরকে ক্ষুদ্ধ করে। এক পর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়, যা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে পর্যবাসিত হয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য: পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এক সুশৃঙ্খল আমলাগোষ্ঠী লাভ করে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো আমলাগোষ্ঠী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমলাশ্রেণি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু এই আমলা গোষ্ঠিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিলো নগণ্য ১৯৪৭ সালে মুসলমান আই.সি.এস. আফিসারদের এক তৃতীয়াংশ ছিলেন পাঞ্জাবি, অবশিষ্টরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ও অবাঙালি রিফুজি মুসলমান। এদেরকে নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস। তারা পাকিস্তান প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলো দখল করেন। স্বভাবতই স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই পাকিস্তান প্রশাসনে অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়। ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করলে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদসমূহের পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।

সরণী-১: ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়ী সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব:

পদ	১৯৫৫ সাল			১৯৫৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শতকরা হার	১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী		
সেক্রেটারী	১৯	১৯		০.০	১৪.০
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৪১	৩৮	৩	৭.৩	৬.০
ডেপুটি সেক্রেটারী	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫	১৮.০
আন্ডার সেক্রেটারী	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০	২০.০
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯	?

উৎস: Safur, A. Akanda, 'East Pakistan and Politics of Regionalism', unpublished Ph. D. Thesis, University of Denver, 1970. (বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১: ড. মো মাহবুবর রহমান)।

কেবল সিভিল সার্ভিসেই নয় ফরেন সার্ভিস বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান ছিলো।

সারনী-২:ফরেন সার্ভিস ও স্টেটব্যাংকের চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরীর ক্ষেত্র	সাল	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা হার
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩	৩১
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮
স্টেটব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫	১৯.৯
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪

উৎস: Safur, A. Akanda, 'East Pakistan and Politics of Regionalism', unpublished Ph. D. thesis, pp. 141–142.

সারণী- ৩: ১৯৫৬ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের সংখ্যা ও হার

পদবি	পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
লে. জেনারেল	৩	০	০.০০
মেজর জেনারেল	২০	০	০.০০
ব্রিগেডিয়ার	৩৪	১	২.৮৫
কর্নেল	৪৯	১	২.০০
লে. কর্নেল	১৯৮	২	১.৩৩
মেজর	৫৯০	১০	১.৬৬
সেনাবাহিনীতে মোট	৮৯৪	১৪	১.৫৬
নেভিতে মোট	৫৯৩	৭	১.১৬
বিমানবাহিনীতে মোট	৬৪০	৬০	৮.৫৭

উৎস: Verrinder Grover (ed.) Encyclopedia of SAARC Nations (New Delhi: Deep & Deep Publication, 1997), pp. 20-21

পরবর্তী বছরগুলোতে এই বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে আনুপাত ছিলো জোয়ানদের ক্ষেত্রে ১:২৫ এবং অফিসারদের ক্ষেত্রে ১:৯০।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য: ১৯৪৭ সালে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিলো। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামি ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়লেও প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা কমেছে। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৪: ১৯৪৭-৪৮ থেকে সময়কালে পূর্ব ও পশিম পাকিস্তানের শিক্ষার অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান		
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি
প্রাইমারি স্কুল	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮	+৩৬৯%	২৯,৬৬৩	২৮,৩০৮	জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৪৫৫টি কমেছে (-৪.৬%)
সেকেণ্ডারী স্কুল	২,৫৯৮	৪,৪৭২	+১৭৬%	৩,৪৮১	৩,৯৬৪	+১১.৪%
বিভিন্ন শ্রেনির কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+৩২০%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ও কৃষি কলেজ	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	২ (৬৫৪ জন শিক্ষার্থী)	৬ (১৮৭০৮ জন শিক্ষার্থী)		১ (১৬২০ জন শিক্ষার্থী)	৪ (৮৮২১ জন শিক্ষার্থী	

উৎস: Bangladesh Documents, p.19.

এছাড়া Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid প্রভৃতি প্রোগ্রামের আওতায় যেসব বৈদেশিক বৃত্তি দেওয়া হয়, তার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে, পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রার্থীরা অনেক সময় এসব বৃত্তির সন্ধানই পেতো না। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা পরোক্ষকভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদের নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য: পূর্ব পাকিস্তানীদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ করা। পাকিস্তানের আমলে ব্রিটেন আমেরিকার অনেক নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, 'The economy development of East Pakistan was sadly neglected and the something ought to be done about it'। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালেই স্পষ্ট হয় এবং তা পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এই বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণগুলো ছিলো:

১। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আর্থিক বিনিয়োগ;
২। পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সকল সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা;
৩। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের;
৪। ব্যাংকিং এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু এই অর্থের মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা সেখানে ব্যয় করা হয়।

সারণী-৫: ১৯৪৭-সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশভিত্তি ব্যক্তির ব্যয় পরিমাণ

ব্যয়ের খাত	পশ্চিম পাকিস্তানে (মিলিয়ন টাকা)	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	পূর্ব পাকিস্তানের ব্যায়ের শতকরা হার
আর্থিক সাহায্য	১০,০০০	১,২৬০	১১.২
মূলধন ব্যয়	২,১০০	৬২০	২২.৮
অনুদান	৫৪০	১৮০	২৫.০
শিক্ষাখাত	১,৫৩০	২৪০	১৩.৩
বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ	৭৩০	১৫০	১৭.০
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	৪,৬৫০	১০০	২.১
মোট	**১৯,৫৫০**	**২,৫৫০**	**১০.২**

উৎস: Safer, A. Akanda, op. cit., p.167

পাকিস্তানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বৈষম্য ছিলো ব্যপক। পাকিস্তানের রাজধানী এবং সকল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সেগুলোর ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও সরবরাহ কাজে যে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুযোগ লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদরদপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ তা প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে এ খাতে কোনো বরাদ্দ ছিলো না।

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিলো ৪৯২৪.১ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিলো ১৬,৬৩৪.৬ মিলিয়ন টাকা। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করা হয়। পাট রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় তা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। আবার দুই অঞ্চলের মধ্যে যে আন্ত:প্রাদেশিক বাণিজ্য হয় তাতেও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত থাকে। ১৯৬৩ সালে তপসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিলো ৩৬, যার মোট ১১৩০ টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো মোট ৬২ টি (৩২%)। স্বভাবতই ব্যাংকিং খাতের সেবা পশ্চিম পাকিস্তানীরাই বেশী লাভ করে। ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার ৯০ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

উপসংহার:

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট বলা যায় যে, পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দে, বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনে ইত্যাদি সকল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক শাসন পুরোমাত্রায় চালু ছিলো। তাছাড়া বাঙালিদেরকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। এমনকি বাঙালিরা নিজ প্রদেশেও স্বশাসনের সুযোগ পায়নি। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো দখল করে রেখেছিলো কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানীরা। ফলে বাঙালিদের দীর্ঘদিনের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচবনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে তারা বাধ্য হয়ে স্বাধীনতার চিন্তা করে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে নিরস্ত্র বাঙালির উপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীই বাঙালীদের বাধ্য করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে, কিন্তু বাঙালির স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং তা অর্জন করতে হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র :

১। ড. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশ, ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, প্রকাশক: ফরিদ আহমেদ, সময় প্রকাশন।
২। মত্তদদ আহমদ, বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, পোষ্ট বক্স ২৬১১ ঢাকা ১০০০।
৩। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রকাশক: ওসমান গণি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০।
৪। আতিকুস সামাদ, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, প্রকাশক: ফয়সাল আরেফিন, রবিউল হাসান অভী, জাগৃতি প্রকাশনী, ১০/বি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।
৫। শামসুল হুদা চৌধুরী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, প্রকাশক: গোলাম মোস্তফা, হাক্কানী পাবলিশার্স, মমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং ৭, সড়ক নং ৪, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫।
৬। এম আর আখতার মুকুল, চল্লিশ থেকে একাত্তর, প্রকাশক: মনিরুল হক, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭। এম আর আখতার মুকুল, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, প্রকাশক: নজরুল ইসলাম বাহার, ১৯৯৯ সালে প্রকাশ প্রকাশ, শিখা প্রকাশনী, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১১০০।
৮। ছদরুদ্দীন, মুক্তিযুদ্ধ: বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, পোস্ট বক্স: ২৬১১, ঢাকা ১০০০।